আবরার, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এবং আমাদের দায়মুক্তি

সাকিব আনোয়ার

| ঢাকা , শুক্রবার, ২৫ অক্টোবর ২০১৯

সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) আবরার ফাহাদ নামে এক শিক্ষার্থী ভিন্নমত পোষণের মতো ‘অমার্জনীয় অপরাধ’ করায় তাকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ঘটনাটি জানার পর দুই দিন পর্যন্ত একরকম বাকরুদ্ধ ছিলাম। নিজের কলেজ বেলার কথা মনে পড়তে শুরু করল। আবরারের মতোই ছুটি কাটিয়ে যখন ঢাকায় ফিরতাম; আমার মাও এভাবে সকালে ঘুম থেকে ডেকে তুলে, খাইয়ে, বাসস্ট্যান্ডে এসে বাসে তুলে দিতেন। বাস তার গতিতে চলতে শুরু করত। জানালা দিয়ে পেছনে তাকিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত দেখা যেত, দেখতাম আমার মা বাসের পেছনে পেছনে হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছেন। জানা হয়নি কখনো কতদূর পর্যন্ত হাঁটতেন, কি ধরতে চাইতেন। কারণ দৃষ্টিসীমার বাইরে যাবার আগ পর্যন্ত তো ছুটতেই দেখতাম। খুব সকালে বা কলেজ ছুটির দিন হলে আমার গুরুগম্ভীর অধ্যক্ষ বাবাও এই উদ্দেশ্যহীন ছোটায় আম্মুর সঙ্গী হতেন। এখনো হন। আবরার হত্যার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য কিছু লিখব না।

লিখতে গেলে লেখাটি হয়ত ব্যাক্তিগত আবেগতাড়িত অথবা অতি আক্রমণাত্মক হয়ে যাবে। কে জানে, সেই লেখার পর আবরারের মায়ের মতো আমার মায়েরও বাসের পেছনে পেছনে আর কষ্ট করে ছুটতে হবে না।

ঘটনার পর বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশে ছাত্ররা হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং বিচারের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকায় সব ক'জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। যে ভিডিও ফুটেজ দেখে অপরাধী শনাক্ত করা হয়েছে সেই ফুটেজটি নিয়েও বুয়েট প্রশাসন আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের পর সারাদিন নাটক করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের পর বুয়েটে টর্চার সেলের নামে ছাত্র নিপীড়নসহ ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের নৃশংসতার খবর প্রকাশ হতে থাকে। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নিপীড়নের বিষয়টি আরও একবার সামনে আসে। একটা ছেলেকে এভাবে ৫-৬ ঘণ্টা যাবত পিটিয়ে মারার পর এই বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন মহলে কথা বলতে, উদ্বিগ্ন হতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি এমন নয় যে, শিক্ষার্থী নিপীড়ন এমনকি মৃত্যুর ঘটনা এটাই প্রথম বা গেস্টরুম, গণরুম, টর্চার সেল বিষয়গুলো নিয়ে এর আগে কথা হয়নি।

হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতারের পর অনেকে আবার সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এমনকি সাংগঠনিক ব্যবস্থা হিসেবে ছাত্রলীগ থেকে অভিযুক্তদের বহিষ্কার করার পর ছাত্রলীগ

এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ থেকে বলা হচ্ছে- এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে ছাত্রলীগ সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দেয় না। এই যুক্তিগুলো এতটাই 'শক্তিশালী' যে তা খণ্ডন করা আমার পক্ষে কেন হয়তো ঈশ্বরের পক্ষেও সম্ভব কিনা তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ছাত্রলীগের দায়িত্বশীল পদে থাকা অবস্থায় পিটিয়ে একজন ছাত্রকে হত্যার পর যেহেতু তাদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে কাজেই এর দায় ছাত্রলীগের নয়। যুক্তি বটে! এতদিন টর্চার সেলে নির্যাতন করেও ছাত্রলীগ নেতা থেকে গেছে। যেই হত্যাকা- ধরা পড়ল তখনই এরা ছাত্রলীগের কেউ না। অর্থাৎ ধরা না পড়লে সন্ত্রাসী ও ছাত্রলীগ। ঠিক যেমন ক'দিন আগে মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদলের ছেলেদের ওপর হামলায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতে যাদের হামলা চালাতে দেখা গেছে তারা ছাত্রলীগের কেউ নন। কারণ হিসেবে ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, ওরা আগের কমিটিতে দায়িত্বশীল পদে থাকলেও বর্তমান কমিটিতে নেই। সুতরাং এই দায় ছাত্রলীগ নেবে না। এত সব যুক্তির ভিড়ে খুঁজেই পাওয়া সম্ভব না যে, কোন প্রেক্ষিতে সংগঠন বা তাদের পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দল এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দায় নেবে।

হত্যাকাণ্ডের পর থেকে অভিযুক্তদের ব্যাপারে ছাত্রলীগ এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, তারা ছাত্রদল বা শিবির থেকে ছাত্রলীগে

অনুপ্রবেশকারী। কারো কারো পরিবারের সদস্যরা বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সেই হিসেবে এই হত্যাকাণ্ডের দায় ছাত্রদল-শিবির বা পারিবারিক সূত্রে বিএনপি-জামায়াতের ওপর বর্তায়। ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই তথ্যগুলো বের করতে পারলেও ছাত্রলীগ বা তাদের অভিভাবক আওয়ামী লীগ এর আগে তা বের করতে পারেনি। অন্তত বুয়েটের মতো একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এত বড় ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বশীল পদে মনোনীত করার আগে খোঁজখবর নেয়ার কথা ছিল। আরেকটি বিষয় হলো ছাত্রলীগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা পরবর্তী সময়ে জাসদ, বিএনপিসহ বিভিন্ন দলে যোগ দিয়েছেন। সেক্ষেত্রে অন্য দলে যোগ দিয়ে সিরাজুল আলম খান, আসম রব, শাহজাহান সিরাজ, মাহমুদুর রহমান মান্না, হাবিবুর রহমান হাবিবদের করা সব অপরাধ, দুর্নীতির দায় একই যুক্তিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ওপর বর্তায়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার এবং দখলদারিত্বের বিষয়টি অনেক পুরনো। ’৯১ সাল থেকেই হল দখল, ক্যাম্পাস দখল এবং ভিন্ন মতের ওপর নিপীড়ন দিনে দিনে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়েছে এবং বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের বিগত ১১ বছরের শাসনামলে সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের এসব কর্মকাণ্ড এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং হলগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে এক

একটি কারাগারের মতো। গত ২০ অক্টোবর প্রথম আলোতে ‘ঢাবিতে বেপরোয়া ছাত্রলীগ’ শিরোনামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উঠে এসেছে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের বীভৎস নির্যাতনের কিছু খণ্ডচিত্র। গেস্টরুম নির্যাতনে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে মারা যান এসএম হলের শিক্ষার্থী হাফিজুর মোল্লা। একই হলের এহসান রফিক ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নির্মম নির্যাতনে একটি চোখের কর্নিয়ায় গুরুতর আঘাত পেয়ে চোখ হারাতে বসেছিলেন। পরে দেশে-বিদেশে অনেক চিকিৎসার পর তিনি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরেননি। ভর্তি হয়েছেন মালয়েশিয়ায় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত হন আবু বকর সিদ্দিক। এছাড়া বিভিন্ন সময় কর্মসূচিতে না যাওয়া, প্রটোকল না দেয়া, শিবিরকর্মী সন্দেহসহ বিভিন্ন অজুহাতে রুমে আটকে রেখে রাতভর নির্যাতন, স্টাম্প দিয়ে পেটানোসহ নানা নির্যাতনের খবর প্রতিনিয়ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং গণমাধ্যমের কল্যাণে আমাদের সামনে এসেছে। এসব ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয় না। দু-একটি ক্ষেত্রে শাস্তি হলেও তা পরবর্তীতে কমিয়ে আনা হয় বা মাফ করে দেয়া হয়। আবরার হত্যার পর দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের নির্মম নির্যাতনের খবর প্রকাশ হতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টারদা সূর্যসেন হলের ছাত্র

মাসউর রহমান সম্প্রতি বিবিসি বাংলাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন- ‘আবরারের সঙ্গে যেটা হয়েছিল সেটা আমার সঙ্গেও করা হয়েছিল। টর্চার সেলে নিয়ে আমাকেও নির্যাতন করা হয়েছিল। কপাল ভালো বলে বেঁচে গেছি।’ এমনকি তার ওপর নির্যাতনের পর তাকেই পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয় এবং দুই মাস কারাভোগের পর সে জামিনে মুক্ত হয় যে মামলাটি এখনো চলমান। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গতবছর মিজানুর রহমান নামে এক শিক্ষার্থী র‍্যাগিংয়ের শিকার হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এছাড়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের থাপ্পড়ে কানের পর্দা ফেটে যাওয়া, বিকৃত যৌন নিপীড়নসহ বিভিন্ন নির্যাতনের খবর প্রতিনিয়তই প্রকাশ পায়। যেহেতু মৃত্যু না হলে তা নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না বা সাম্প্রতিক সময়ের উদ্যোগ হিসেবে আক্রান্তদের পরিবারের গণভবনের টিকিট মেলে না; তাই প্রভোস্ট, প্রক্টর, উপাচার্যসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব অভিযোগ অতিরঞ্জিত বলেই প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে প্রশাসনের কোন ক্ষমতা নেই বললেই চলে। প্রাধ্যক্ষ বা আবাসিক শিক্ষকেরাও ছাত্রদের রুমে যেতে পারেন না। তারা জানেনও না যে কোন রুমে কারা বা কতজন থাকেন। হলগুলোতে সিট বণ্টনের ক্ষমতা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হাতে। এছাড়া ম্যানার শেখানোর নামে হলের গেস্টরুম, গণরুমগুলোতে চলে শারীরিক ও মানসিক

নির্যাতন। এমনকি নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখার জন্য হলগুলোতে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রের মজুদ রয়েছে বলে সম্প্রতি বিভিন্ন প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন বৈধ করার আরেকটি প্রচলিত টেকনিক হল মারধরের পর তাকে শিবির কর্মী আখ্যা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা। শত শত মামলার হাজার হাজার অজ্ঞাতনামার মধ্যে কোন একটিতে ঢুকিয়ে দিতে পুলিশেরও খুব একটা বেগ পেতে হয় না। আবরারের মৃত্যুর পর অনেককে বলতে দেখা গেছে- ও তো শিবির কর্মী ছিল না। কেউ কেউ বলেছেন- আবরার তো রাজনীতি করত না। বিষয়টি এমন যে শিবির কর্মী হলে বা রাজনীতি সংশ্লিষ্ট হলে একজন শিক্ষার্থীকে মারধর করা এমনকি মেরে ফেলাও ছাত্রলীগের জন্য জাস্টিফাইড।

আবরার আর ফিরবে না কোনদিন। আবরারের মা আর কোনদিন চালের রুটি আর মাংস বাটি ভরে দিয়ে দেবে না হলে পৌঁছে খাওয়ার জন্য। অনেক ডেকেও আর ঘুম ভাঙানো যাবে না ওর। বাস ছেড়ে যাবে। গন্তব্যে পৌঁছে যাবে কিন্তু ও ঘুমিয়েই থাকবে। বুয়েট ছুটি হবে, ঈদ-পূজা-পার্বণে সবাই বাবা-মায়ের কাছে ফিরবে। আর আবরার... ও তো ফিরেছে; লাশ হয়ে, কান্না হয়ে, চিৎকার হয়ে, স্লোগান হয়ে, প্রতিবাদ হয়ে, সন্ত্রাস নিপীড়ন মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের দাবি হয়ে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আবরারই হয়তো ক্যাম্পাসগুলোতে ফিরিয়ে আনবে শৃঙ্খলা। মরে যাওয়ার আগে একটু পানি খেতে চাওয়ার পরও পানি না পেয়ে

আবরার হয়তো নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতার লাইনগুলো আওড়াতে-আওড়াতে চলে গেছে না ফেরার দেশে।

‘আমাকে হত্যা করলে-
বাংলার সব ক’টি মাটির প্রদীপ শিখা হয়ে ছড়িয়ে যাবে আমার বিনাশ নেই-
বছর বছর মাটির মধ্য হতে সবুজ আশ্বাস হয়ে ফিরে আসব।’

কতদিন আবরারকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে পত্রিকার প্রতিবেদনে, উপ-সম্পাদকীয়তে, মিটিংয়ে, মিছিলে, সভা-সমাবেশে, সেমিনার-গোলটেবিলে; তা কারো পক্ষে বলা সম্ভব না। কারণ নতুন নতুন খবরের ভিড়ে আবরার একসময় ব্রাত্য হয়ে যাবে আমাদের কাছে। নতুন কিছু নিয়ে লিখব। হয়তো পদ্মা সেতুর নতুন স্প্যান বসবে, মেট্রোরেল চলতে শুরু করবে, নাসা-ইসরো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে অথবা নতুন কোন নুসরাত বা আবরার, নতুন কোন দীর্ঘশ্বাস, কয়েক দিনের আহাজারি। আমরাও দু-একটি কলাম লিখে, রাজনৈতিক নেতারা দু-একটি সভা-সমাবেশ করে, বুদ্ধিজীবীরা দু-একটি গোলটেবিল-সেমিনার করে দায়মুক্ত হব।

ভালো থেকো আবরার। আমাদের ক্ষমা করো না।

[লেখক : কলামিস্ট]
mnsaqeeb@gmail.com